আগুন পাখি

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কখনো কখনো এমন উপন্যাসের মুখোমুখি হতে হয় যখন সত্তা বা অস্তিত্বই যেন পাল্টে যেতে থাকে, যিনি মুখোমুখি হচ্ছেন তাঁর। মহৎ সব উপন্যাস সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য, কিন্তু মাঝেমধ্যে এমন উপন্যাস সামনে এসে দাঁড়ায় যাতে আমার মতো মধ্যবিত্ত পাঠক তার তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার আবহে চমকে ওঠে। পশ্চিমী এসময়ের যাঁদের উপন্যাসে তিনি তাড়িত, সেউ উম্বার্তো ইকো, মিলান কুন্দেরা, সারামাগো বা তুরস্কের ওরহান পামুক, কিংবা লাতিন আমেরিকার মার্কেজ, সেই সব উপন্যাস পাঠের ক্রিয়া যেন দাঁড়িয়ে যায় এ উপন্যাসের জগতে। এত সহজ ও সরল অথচ এ গভীর, বহুস্বরে বেজে ওঠা উপন্যাসটি আগুন পাখি হয়েই তছনছ করে দেয় আমার বাঙালী সত্তাকে। স্তরে স্তরে আগুনপাখি গল্পের, রূপকে সীমা ছাড়িয়ে এক প্রতীকের মহাঙ্গনে মুক্তি পায়। এই সহজতা, এই সারল্য অনেক পরিশ্রমলব্ধ। জটিল সময়ে এক ট্র্যাজিক অভিঘাতে এ সহজ নির্মিতি— কেমন যেন মনে হয়, এ রবীন্দ্রনাথের গানের মত, বাইরে সহজ গভীর গহনের জটিল স্থাপত্যের ওপর দাঁড়িয়ে।

রঁলা বার্ত একদা ঘোষণা করেছিলেন, অথর মারা গেছে। বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন, অথরের অথরিটির মৃত্যু হয়েছে। হাসান আজিজুল হক উচ্চশিক্ষিত বাঙালী, দর্শনের অধ্যাপক, এলিট - পরিমণ্ডলেও তিনি যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ - আগুনপাখি এই অথরের মৃত্যু ঘোষণা করে। অথচ খুবই কঠিন ছিল ঐ জীবন - স্পন্দিত মৃত্যু। সম্ভাবনা ছিল অথরের আরোপে গল্পের মুখ ঘোরা, তাঁর ভাবনা - চিন্তার চাপে আগুনপাখির নারীর অক্ষটি দুলে যাওয়া। মনে রাখতে হয়, ঐ নারী কিন্তু হাসান আজিজুল হক - এরই নির্মাণ। তাঁরই বীক্ষা ও চৈতন্যজাত। তাঁর অভিজ্ঞতার পাথরগুলিকে তিনি চৈতন্যে নমনীয় করে শিল্পের নদীটিকে প্রবাহিত করেছেন। কিন্তু ঐ বীক্ষা বা চৈতন্যকে স্থানান্তরিত করা, রূপান্তরিত করা অসমসাহসিক শিল্পান্বেষায় অথর যেন বিলীন হতে চাইলেন। অথরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অথর আছেন, তিনিই উপন্যাসটির বিশ্বকে তৈরি করেছেন। আবার নেই। আর নেই-টা আরও বাঙ্ময় হয়েছে ভাষায়। উপন্যাস শেষ পর্যন্ত ভাষা - আগুনপাখি' উপন্যাসের বাস্তব অনেকটাই ভাষার বাস্তব। যে নারী নিজের গল্প বলছে সে তার বর্গর ভাষায় কথা বলছে— সে ভাষা হাসান আজিজুল হক বা তার মধ্যবিত্ত পাঠকের ভাষা নয়। উপন্যাসের শুরু এভাবে : 'ভাঁই কাঁকালে পুঁটুলি হলো।' শেষ শিরোনাম : 'আর কেউ নাই, এইবার আমি একা।' উপন্যাসের প্রথম বাক্য: 'আমার মায়ের য্যাকন মিত্যু ভাই - বুনকে অকূলে ভাসিয়ে মা আমার চোখ বুজল। তখনকার দিনে কে যি কিসে মরত ধরাবার বাগ ছিল না।' আর শেষের উচ্চারণ: 'বাড়িতে আমি একা রয়েছি। আর কেউ নাই, কেউ থাকবে না। আজ দোপরের খানিক বাদে চেরকালের লেগে কাটান ছিটেন করে সব চলে গেল।' একই ভাষা, কিন্তু কোথায় যেন দুটি উচ্চারণ পৃথক। উপন্যাস জুড়ে যে কতকথা, যে গল্প বলা তার টানে ভাষা বাইরের চেহারা এক থাকলেও, ভেতরে যেন কোথায় পাল্টে গেছে। ভাষাকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা, আবার চলমান রাখা, এক স্বরের নানা আলোকছায়া রক্ষা করা দুহূহ। 'আগুনপাখি' -তে লেখকের ন্যারেশন কিছু নেই —আছে একটি মেয়ের নিজের ভাষায় বলা জীবনকথা—এই জীবনকথা বিশ, শতকের গোড়ার দিক থেকে শুরু হয়ে ১৯৪৭ - পেরিয়ে প্রসারিত।

উপন্যাসটি একটি মেয়ের আত্মজীবনী। উপন্যাসের চরিত্রর— গ্রামের একটি মেয়ের, বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি আর তাকে ঘিরে থাকা গাঁয়ের মানুষজন, হিন্দু বেশি মুসলমান কম। সে একটি মুসলমান পরিবারের মেয়ে ও পরে আর একটি মুসলমান একান্নবর্তী পরিবারের বউ। একটি ফিক্শানাল চরিত্রের আত্মজীবনীতে মেশে আমাদের সময়ের জীবনী। ঐ আপাতভাবে সীমায়িত জগতের একটি মেয়ে তার জীবনকথা বলছে, বৃহত্তর মাত্রা এই গ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্রিয়াশীল, মেয়েটির ব্যক্তিক, পারিবারিক অক্ষেই ধরা দিয়েছে বড় সময়ের ট্রাজেডি। এই retrospective ন্যারেটিভ নিজ অস্তিত্বর যে বাস্তব ও প্রকৃত উদঘাটন করে, তা প্রচলিত অর্থে কোন রিয়্যাল মানুষের নয়, কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবের সংলাপে ঐ ব্যক্তি রিয়্যাল হয়ে ওঠে, শিল্পের 'মিথ্যা'-র শান্ত, সংসারে নিবেদিত মেয়েটি ক্রমে আগুনপাখি-র শান্ত, সংসারে নিবেদিত মেয়েটি ক্রমে আগুনপাখি হয়ে ওঠে সংসারের অগ্নিগহ্বরে।

উপন্যাসটি প্রত্যক্ষত একস্বরিক। একজন মানুষের স্বরই পুরোভাগে। কিন্তু ঐ স্বরই এমনভাবে বেজেছে যে হয়ে উঠেছে বহুস্বরিক— আসলে হাসান আজিজুল হক এমন একজন মানুষের নির্মাণ এই গল্পে করেছেন যে একস্বরে বাঁচে না— নিজের স্বরের মধ্যে ও সংযোগে ঐ মানুষ তথাকথিত আধুনিকের ইন্ডিভিজুয়াল হয় না, হয়ে ওঠে পার্সন। যখনই সে তার বাপজি বা স্বামী, তার আত্মীয়স্বজন বা দাদির কথা বলছে, গ্রামের মানুষের কথা বলছে, তখনই এক কৌম, কমিউনিটি, পরিবার তার স্বরের সঙ্গে নিশে তৈরি করেছে জীবন ও সময়ের অর্কেস্ট্রা। আপনাকে জানার এক প্রক্রিয়া এ উপন্যাসে অফুরান। আর ঐ জানতে জানতে বদলে গেছে তার নিজের স্বর— ইতিহাসের, বহির্বাস্তবের ভয়ঙ্কর এক ট্রাজেডির উন্মোচনে ঐ মানুষ নিজের প্রাথমিক স্বরকে ছাপিয়ে নতুন স্বরে সংলাপে ঝড়ে ওলটপালট দীর্ঘ বৃক্ষর মতই ঋজু দাঁড়িয়ে, তার মূল প্রোথিত মৃত্তিকার গভীরে, ইতিহাসের ক্ষেত্রনাট্যকে, কবন্ধ অন্ধকারকে প্রত্যাখ্যান করে এ মানুষ একা : 'আমি একা। তা হোক, সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি। একা।' যে মানুষ উপ্যন্যাস জুড়ে অন্যের সংযোগে বাঁচতে চেয়েছে, আজ সে একা — একটি শেষ বিচ্ছিন্ন লাইনে এপাশে ওপাশে শব্দ নেই, ভাষা নেই— একা। এই একা আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ভয়াবহ অন্তর্জলের যোগাযোগের মধ্যে আগুনপাখির স্বপ্নের একাকীত্ব। উপন্যাসের শুরুর ঐ মানুষ আর শেষের, এক নয় : অভিজ্ঞতার আগুনে ঐ মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে। 'আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি সব কিছু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি।' এই আমি-র উন্মোচন আগুনপাখি উপন্যাসের মূল গল্প। পারিবারিক অক্ষে এই মুসলমান এই মানুষ দেশ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে। এ প্রশ্নে রাষ্ট্র - নেশন ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতদের তত্ত্ব - তর্ক - পর্বে সৃষ্টি করেছিলো নিজের দেশ: আজ তাকে বলা হচ্ছে এ দেশ তোমার নয়, তোমাকে যেতে হবে মুসলমানদের দেশে, এ মানুষ এ যুক্তি মানতে পারে না— কারণ সে তো তার, তাদের সৃষ্টি দেশের মানুষ।

মধ্যবিত্ত পাঠকের মনে হতে পারে এই মৌলিক প্রশ্ন মানুষটি তোলার চৈতন্য কোথা থেকে পেল। সে তো গ্রামীণ পরিবারের সীমায় বড়ো হয়েছে, বৃহত্তর বাইরের কথা তো সে বেশি সেভাবে জানে না। স্বামীর তাগিদে সামান্য পড়তে শিখেছে মাত্র - এদিকে বিয়ের আগে বাপজি ও বিয়ের পরে স্বামী এই দুই পুরুষ তার ভাবনার জগৎকে বিপরীতভাবে গঠন করেছে। আর আগুনপাখির গল্পে ভিতটাই এখানে। বাড়ির বৌ সংসারের অক্ষের মধ্যেই অভিজ্ঞতার নানা বৃত্ত পেরিয়ে আসে। সেই যে মারকিউজ বলেছিলেন না, শিল্প যেন 'non - conceptual path of the senses.' এই উপন্যাসে ওই মানুষটি কোন তত্ত্বর উত্তর খোঁজেনি, খুঁজেছে তার অভিজ্ঞতার, তার অস্তিত্বর উত্তর। আর এই উত্তর খোঁজার মধ্যেই রয়ে গেছে রাষ্ট্র - জাতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক উত্তর পাওয়ার প্রবল প্রশ্নটি।

উপন্যাসের আগুনপাখি একজন নারী। উপন্যাসটি কি প্রচলিত নারীচেতনার? নারীর আপনতা থাকার কথা উপন্যাসে কখনো

কখনো এসেছে। 'আমি কিন্তুক একদিনও পাঠশালে যাইনাই। বাপজি যেতে দেয়নাই। মেয়ে আবার পাঠশালে যেয়ে ল্যাখাপড়া শিখে কি করবে? খানিকটা বেয়াদপ হবে, মুখের ওপর কথা বলবে— এই তো?' বিয়ের সময় 'সম্বন্ধ এল, কথাবাত্তা হতে লাগল কিন্তু আমাকে কেউ একটী কথাও শুদুলে না। শুদুবেই বা ক্যানে? ই ব্যাপারে আমার তো কুনো কথা নাই। মুরুব্বিরা যা করবে তাই হবে। তারা যেদিন মনে করে একটা কলাগাছের সাথে আমার বিয়ে দেবে, আমাকে তাই মানতে হবে। এমনই ছিল ত্যাকনকার দিন। ছেলে হয়তো ত্যাতোটা লয়, মেয়ে হলো বাপের আঘিন্নে দায়। বাপ যেদি মনে করে মেয়েকে কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেবে, তাতে কারু কিছু বলার নাই।' আরেক জায়গায়? 'গাঁধার খাটুনি খাটতে খাটতে মনে হয়, পিতিদিন রাজ্যের লোকের পিণ্ডির বেবসথা করতে করতে হিমশিম খেয়ে গেলে মনে হয় শ্বাশুড়ি - ননদের বাঁদিগিরি করতে করতে মনে হয়। তারা নিজেরা বাঁদি-চাকর না ভাবলেও মনে হয়। জ্যা -রা য্যাকন গিদের ঘরে বসে থাকে, টিটেমি করে, গরজ ঠাওরায়, ত্যাকন ইসব মনে হয়। ত্যাকন যেন নিজের ছেলেমেয়ে - সোয়ামি - সংসার সবই বিষ, খেতে খেতে এমন হয়েছে যি অ্যাকন এই বিষেও নেশা লাগে।' শেষ বাক্যে নারীর উভবল অবস্থান স্পষ্ট হয়। এতদিন দুনিয়ার কিছুই থাকে না। 'সারা জেবনে বাড়ি থেকে তিন কোশ চার কোশের বেশি যেতে হয় নাই। কেউ নিয়ে যায় নাই। মাঠঘাট, ঘরবাড়ি, আসমান-জমিন ওইটুকু যা দেখলাম। কবর কেমন হবে জানিনা, তবে কমনে হয়,কবরের থেকে একটু বড় এই সোংসার। কবর জয়গাটা তবু নিজের নিজের সংসারে সব নিজের লয়। সোংসার থেকে যা দেখা যায়— আসমান - জমিন-সিতো কবরের উপমায় ধরা পড়ে । পিথিমির কিছু না দেখা মানুষটির আত্মসচেতনাকে। নারী হয়ে জন্মাবার জ্বালাকে। কিন্তু ওই 'জন জ্বলে গেলে'-কে ছাপিয়ে, নারীর পরাধীন বন্ধজীবনের যন্ত্রণা ছাপিয়ে এ উপন্যাসে মানুষটি তার সংযোগ ও সম্পর্কের দ্বন্দ্বময়তায় আসমান ও জমিকে অন্যভাবে পায়। জ্বালাটাই তার অস্তিত্বের একমাত্র কথা নয়। একান্নবর্তী পরিবারের হাল যে ধরেছে সেই মেজপুত্রের কাজিয়া নেই। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবার সময় ঐ মা কেঁদে ভাসায়, দৃঢ়চিত্তে বেহাল সংসারকে মেজছেলের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলায় আক্রান্ত আরেক নারী শাশুড়ি- যিনি এই মানুষটিকে আগলে রাখেন নিজ নিরপেক্ষ আচরণে।

আসলে হাসান আজিজুল হক গল্প বলেন এক ভয়ঙ্কর ভাঙনের। তাই উপন্যাসের প্রথমার্ধ নিটোল পরিবার ও কৌমের গল্প। একটি পরিবারের উঠে দাঁড়ানোর গল্প— সংহত জীবনের গল্প। কথক মানুষটি গ্রামীণ মানদণ্ডের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে নয়, আবার সেরকম পরিবারের বউও নয়। বরঞ্চ তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর পরিবার সমৃদ্ধির মুখ দেখে। হিন্দু মুসলামান মিলিয়ে এক যৌগিক কম্পোজিট বাস্তবের মধ্যে ঐ পরিবার তার স্বামীর বুদ্ধি - সততা - উদ্যোগের হাত ধরে দাঁড়ায়। চোদ্দ বছরের মানুষটির বিয়ে হয় - প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — মানুষটির বয়স প্রায় চল্লিশ। ঐ চোদ্দ বছরের মেয়ের অনুভূতিতে কমিউনিটি ও সমাজের ঐক্য ও তার ফাঁক দুইই ধরা পড়েছিল। বিয়ের পর রাজবাড়ির কত্তামার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। কত্তামা স্নেহে তাকে গ্রহণ করে, এক গা নতুন গয়না পরিয়ে দেয়। পাথরের থালার শহর থেকে আনা নানা মিষ্টি। রাজা হিন্দু - কত্তা মা হিন্দু। মানুষটির বর ওবাড়ির ছেলের কত্তাকে নাম ধরে ডেকে বললে, বউমা আমার সোনার পিতিমে, খবরদার তাকে কোনোদিন কষ্ট দিবিনা। তাতে তোর ভালো হবে না। একটো মজার কথা বলি। এত যি কাণ্ড হলো, কত্তামা কিন্তু একবারও আমার গায়ে হাত দিলে না, ছুঁলে না। জানা কথা, সব মিটে গেলে কত্তামা আর একবার গা ধুয়ে কাপড় বদলে তবে ঘরের কাজ করবে।' 'তুমি আমার বড় ছেলের বউ। তোমার কিন্তু দেওর - ননদ আছে। তারা সব ছোট।' তেমনি ঐ সংযোগের ফাঁকটাও ধরা পড়ে : এক আকাশ, এক জল - হাওয়া, একভাষার নিবিড়তার মধ্যেও ওই না- ছোঁয়া, গা - ধোওয়া।

উপন্যাসটি জীবনের দৈনন্দিন প্রাত্যহিক গল্প। এ গল্পের কথক ঐ জীবনের কথা বলে, তার কথকথায় উঠে আসে বিশ শতকের প্রথমার্ধের গ্রামে জীবনস্রোত। জন্ম-মৃত্যু, আনন্দ - বিষাদ, সফলতা - ব্যর্থতার এক মহাখ্যান যেন ছোট জীবনকে কেন্দ্র করে সময়ের প্রবাহে বলা হয়। কথক - নারী তার গল্প বলে একটা নৈর্ব্যক্তিক আবেগে — জন্ম ও মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে দেখে, অবশ্যই পুত্রের সান্নিপাতিকে মৃত্যুতে তীব্র শোকের আঘাত সে পায়। তারপরেও সন্তান আসে, তারপরেও জীবন চলে। লক্ষণীয়, মানুষটির এই গল্পে ধর্মাচরণের দীর্ঘ কোন স্থান নেই। একটি মুসলমান পরিবারের বধুর বয়ানে আছে জীবনের ছবি : এই গল্পের মানুষগুলি ধর্মের গুহায় বাস করে না। প্রাত্যাহিক জীবনের বাঁচায় - মরায় এটা থাকে না: মানুষটির ক্রমপ্রসারিত চৈতন্যেও এ ছিল না। হিন্দু - মুসলমানের দূরত্ব সে কত্তামার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় বুঝেছিল, কিন্তু তার অনুভূতিতে এসব পুরোভূমিতে আসেনি, এসেছে পরস্পরের নৈকট্য, ভালোবাসা। কত্তামা তার স্বামীকেই বড় ছেলে বলে মনে করেছে। উপন্যাসটি এ অর্থে কোন সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র কৌমের, বাস্তবের। একটি ঐক্যবদ্ধ সংহত জীবনের ছবি, নানা আত্মীয়দের নিয়ে পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকা হয়— বলা হয় গ্রামের রাস্তা হওয়ার গল্প, সে রাস্তা দিয়ে মানুষটির যাত্রার বিবরণ যেন প্রতীকী হয়ে ওঠে। এ গল্প অতীতের, আসলে আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নেরও।

ঐ জীবন ভেঙে যাওয়ার গল্প মানুষটি বলে তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। গ্রামের আগুন লাগলে মানুষটির কর্তা তার প্রতিপক্ষে দাঁড়ায়, আগুন নেবে, আগুনের সর্বস্বান্তদের পুনর্বাসন হয়। 'কত্তা হাতজোড় করে গাঁয়ে গাঁয়ে যেয়ে অবস্থাপন্ন চাষি গেরস্থদের কাছে বাঁশ - খড় - কাঠ এই সব যাঞা করতে লাগল।' এ এক সংহত জনসমাজের ছবি। এ জনসমাজের ঝড় - আগুন আসে, কলেরা বসন্ত আসে, আবার জীবন বহমান হয়। কথক মানুষটির এসব সম্পর্কেই এক নিরাসক্ত দৃষ্টি থাকে, থাকে সাধারণ মানুষের অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান যা মাঝে মধ্যে যেন একটা দর্শনের সীমা ছোঁয়। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদে কত্তা জিতলে 'যি আনন্দ ফুত্তি হতে লাগল তাতে ভালই বোঝলাম, কত্তা হিন্দু - মুসলমান সক্কলেরই নয়নমণি।' মানুষটি এটাই ভাঙতে দেখে যুদ্ধ - আকাল - দাঙ্গায়। 'আগুনপাখি' দেখায় বিশ শতকের চল্লিশের দশকে যুদ্ধ - আকাল- দাঙ্গাই নিয়ে আসে দেশ বিভাগের মানসিক ভূমিকা। ব্রিটিশ, রাজনৈতিক দলগুলি একে সাহায্য করে কিন্তু ১৯৪০ -এও যার ছায়া অলক্ষ্য, তা যেন সাতবছরের মধ্যে কায়া ধরে দানবের মতো চেপে বসে।

ভাঙতে থাকে ঐ সংহত কৌম, জনসমাজ। একশ' তেত্রিশ পৃষ্ঠায় পড়ি: যুদ্ধের ফল এই বোধহয় শুরু হল। প্রশ্ন: যুদ্ধের কুনো কিছু তো এখনো ই-দ্যাশে হয় নাই। তাহলে হঠাৎ হঠাৎ এক একটো জিনিশ ক্যানে নাই হবে? জিপগাড়ির সন্ত্রাস, আকাশে 'পেলেন'। 'যুদ্ধ ছাড়া অ্যাকন আর কুনো কথা নাই। গোরা পল্টনের গা থেকে লিকিনি কেমন একটো বোটকা গন্ধ পাওয়া যায়, বললে না কেউ পেত্যয় যাবে সেই বোটকা গল্প অ্যাকন সারা দ্যাশে, পল্টন কাছে থাকুক আর না থাকুক। ই গন্ধই অ্যাকন যুদ্ধর গন্ধ। রুগির ঘরে সেই সেই গন্ধ, ভাতের থালায় সেই গন্ধ, ছেলের গায়ে সেই গন্ধ। চামড়া শুকনোর গন্ধ।' যুদ্ধের এই গন্ধ তো গবেষণাগ্রন্থে পাওয়া যায় না, এ একজন মানুষের অভিজ্ঞতা, এই গন্ধ দেয় যুদ্ধের অভিঘাতে, সেভাবে যুদ্ধ নেই, তার গন্ধ আছে। ঐ গন্ধই নিয়ে আসে আরও অনেক কিছু — গন্ধের পরেই আসে অবিশ্রাম বাদলের কথা। ঐ বাদলের মধ্যে দেখা যায় চট দিয়ে শরম বাঁচিয়ে এক নারীর ভাত চুরি ঃ উ: মেয়ের দু - চোখের জমিন কি শাদা। ভেঙে পড়া মল্লিকদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে মানুষটির মনে হয়: সাথে সাথে সারা বাড়িটা এমন আনকা লাগল যেন আগে কুনোদিন বাড়িটাই দেখি নাই। ভাঙা ঘরের ভেতরে থেকে একঘর আঁদার আর একটো খারাপ গন্ধ — আফলা ভাপ এসে আমার নাকে লাগল আর মানুষ ন্যাংটো হয়ে যেমন লাগে ঘরটাকে তেমনি একদম ন্যাংটো মনে হলো। ঘরের ভেতর যা যা আছে সব

দেখতে পাওয়া যেচে যি! যা মানুষ দেখায় না, সি-সব দেখা যেচে। ভাঙা পুটো পচা সব জিনিস। জানে ধরে উসব জিনিস ফেলে দিতে পারে নাই। এই ন্যাংটো হয়ে গেল সময়, ভেতরের ফুটো - ফাটা বেরিয়ে পড়ল। এমন মানুষটি যে কৌমে, যে সমাজে বাস করেছে তা নেই। এই দেয়াল ভেঙে গিয়ে ভেতরকার অন্য ছবি আস্তে - আস্তে মানুষটির সামনে নিয়ে এল যুদ্ধ - আকাল - দাঙ্গা।

নাই, নাই, কিছুই নাই। এই নাই - এর মধ্যে সংসারেও ভাঙ্গনের রেখা। 'এ তো একটা সংসার লয়, পাঁচটো সংসার; এ তো ডালপালা বাড়া নয়, ই বটগাছের মতুন। আলেদা আলেদা ঝুরি নেমে আলেদা আলেদা বটগাছ হয়েছে অর মূল গুঁড়িটো অ্যাকন আর মটেই নাই, ফোঁপরা হয়ে কবে শ্যাষ হয়ে গেয়েছে। গিন্নি মূল গুঁড়ি, সে থাকতে থাকতেই যার যার ঝুরি নামছিল। অ্যাকন আর সেই গুঁড়িই নাই, মূল গাছটা থাকবে কি করে? জা -এরা স্বার্থপর, মানুষটিও কি নিজের ঝুরি নামিয়েছে। বড় খোকা নেই। সে বেঁচে থাকলে সেও কি স্বার্থপর হতো। 'কিন্তুক সে নাই, সে চলে যাবার পর আমার জেবনে জেবন নাই, কোথাও খুঁটি পুঁতি নাই, কোথাও ঝুরি নামাই নাই। আমার এই কতা কেউ জানে না। আমার ঝুড়ি মাটিতে নাই বাতাসে আলগু ঝুলছে।' চূড়ান্ত একা হবার শিকড় নামায়নি - লক্ষণীয়, একথা মানুষটি বলছে ইতিহাসের নিদারুণ সংকটে, যুদ্ধ আকাল মিলে তৈরি করেছে এক বাস্তব, সেই বটবৃক্ষের গুঁড়ি আর নেই : সংসারের গিন্নির মতই সময়ের কেন্দ্র মৃত। মানুষটি তার অভিজ্ঞতার চৈতন্যে বোঝে: 'যুদ্ধ তো ছিলই, তাতে তেমন কিছু হয় নাই। কিন্তু মাত্র দু'বছরে আকালে দুনিয়া অন্যরকম হয়ে গেল।' সংসার ভাঙল— ঐ পরিবারিক ভাঙ্গন, ভিন্ন হওয়া, কত্তার দর্শকের ভূমিকা আরও বড় ভাঙ্গনেরই পূর্ব প্রতিরূপ। মানুষটি তার পরিবার - গ্রাম সব নিয়ে যে সংহত জগতে ছিল তার ভাঙ্গন এল, যুদ্ধ আকাল সব শেষে দাঙ্গা - পরিবারের চিত্রকল্পেই বড় বাস্তবে আসে, 'সোংসারের ভেতরটো এইবার তাকিয়ে দেখতে প্যালম আর সোংসারের মধ্যে মানুষ কি, তা-ও দেখলাম। কুকুর - বেড়ালে ছেঁড়াছেড়ি দেখে রাগ করি কিন্তু মানুষ কুকুর - বেড়ালের চাইতে কিসে ভালো? মূলে টান পড়লে সবাই সমান। সেই মূল হবে প্যাট। ...পেটের খোরাকি নাই তো কিছু নাই, তুমি নাই, আমি নাই, কেউ নাই। এই দ্যাশে সেই মূলের নাম হচে ধান।' এই ধান থেকেই খাবার, কাপড় সব। সংসারের দুভাই স্ত্রীর কথা শুনে মারামারি করল— মানুষটির এই অভিজ্ঞতাই বড় বাস্তবে দেখা দিল। হিন্দু - মুসলমান, ভাইয়ে বাইয়ে দাঙ্গা। ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, সবাই পেথগন্ন হলো।

এত খুন, এত লউ, মানুষ মানুষের কাছে আসছে খুন করার লেগে — যুদ্ধের তেজ মরে এসেছে, দু বছর আকালের পর আবার ফসল হলো, চোরা কারবারিরা পারলে না আকাল চালিয়ে যেতে, যুদ্ধ বন্ধ হলো— ১৯৪৬। 'কিন্তুক মোসলমানদের লেগে আলেদা একটা দ্যাশের কথা ক'বছর থেকেই শুনে আসছি। ই নি কতো কথা থাকে কাগজে, কত্তাও অ্যানেক কথা বলে এই নিয়ে। তারপর থেকে শুনছি মোসলমানদের আলেদা একটো দ্যাশের খুব আন্দোলন চলছে, সি লিকিনি না করে ছাড়বে না। আর পড়তে লাগলম, শুনতেও লাগলম কটি নাম— জিন্না, নেহেরু, গান্ধি, প্যাটেল। মানুষটি কত্তার কথা শোনে - জিন্নার সমালোচনা, প্যাটেলের। শুধায়, মোসলমানদের দেশ কি, সব মোসলমান সেখানে বাস করবে? আরে দূর, তাই কি কখনো হয়। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কত দেশ আছে। 'আমাদের এই ভারতেই কত দেশ।' তাহলে আলাদা দেশের কথা কেন? 'আমাদের এই দ্যাসের মুসলমানকেই যেদি একটা দ্যাশের মধ্যে রাখতে না পারে তাইলে উকথা হচে ক্যানো?' মানুষটির প্রশ্নের উত্তর নেই। দাঙ্গা বাড়ে — পরিচিত হিন্দু - মুসলমান খুন হয়। মানুষটি প্রশ্নে - প্রশ্নে উদ্বেল হয়ে পড়ে : 'আমরা কার কি করেছি যি সেই গাঁয়ের এক মায়ের অন্ধের নড়িপুতকে কেটে দুখন্ড করে দেবে?' রায় বাড়িতে অনেক দ্বিধায় পর যায় সে - পুত্রহারা মা এই মুসলমান নারীকে কি বলবে? শোনে, 'আমাকে কি সৌভাগ্যি যে তুমি এই বাড়িতে এসেছ - আমি যি মা।'

এই মায়ের অস্তিত্বে দেশ মূর্ত হয়। কোন বিমূর্ত দেশমাতৃকা বা বন্দে মাতরম নয়, এই এক আধার। মানুষটি যে রায় - গিন্নিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলনা, তার কারন তো আমি মুসলামন আর রায় গিন্নি হিঁদু। মানুষটি সীমানা পেরোতে চায়, রায়গিন্নির চিৎকার বাজে, আর যেন কারু এমনি করে কোল খালি না হয়। ভগবানকে বোলো আমি যেন কাউকে শাপ - শাপান্ত না করি। মানুষটির কানে আসে হিঁদুদের মতিগতি ভালো নয়। তাহলে সব মিছে হয়ে গেল। কত্তামা সেই এক গা গয়না পরিয়ে দিয়েছিল, বড় খোকা মরলে কত্তার গলা জড়িয়ে ভট্টচায্যির দাঁড়িয়ে থাকা, সে কি লোক দেখানো আদিখ্যেতা শুধু। আর ইদিকে যে আপন ভাইরা এক কথায় পেথগন্ন হয়ে গেল, সি বুঝিন কিছু লয়। বিষম কেরমে কেরমে আমার ভেতরেও ঢুকতে লাগল? সব বদলে গেছে? সব গোলমাল হয়ে গেছে, কত্তার যে এত জ্ঞান, সেও চুপ। আমার কিছু করার নেই। আমি তো আমি, হিন্দু মুসলমানেরা কোনো লড়াই এখন আর এই আগুন সামলাতে পারবে না। আগুনে দেশ পুড়ে ছারখার হচ্ছে। এই আগুনের মধ্যে দিয়েই জেগে উঠে এক আগুনপাখি— হত্যার খবর ঐ পাখিকে নিয়ে গেছে এ প্রত্যয়ে, দেশ সম্পর্কে এক ধারণায় বাড়ির সীমায় আপাত আটকে থাকা মানুষটি যতবার বহির্বাস্তবের এই আগুনে হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করতে গেছে ততই পাঁকে ডুবে গেছে। তার মনে হয় যে, দাঙ্গা-প্রতিদাঙ্গায় খুন - প্রতিখুনের নিষ্ঠুরতায় তো হিন্দু - মুসলমান এরকম — সত্য-র মা আর ইউসুফের মা কি আলাদা? রক্ত তো একই। কত্তা জানায়, হিন্দু - মুসলমান দুই জাতকে ইংরেজরা চিরদিনের মতো পরস্পরের শত্রু করে দিল— পাকিস্তানের নাম করে জিন্না আর ক্ষমতার লোভে জিন্না - নেহরু - প্যাটেল - শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজদের কাজটাই করলো। দাঙ্গাও কমতে থাকে, কারণ মানুষটি জানে ''দাঙ্গা লিয়ম নয়, শান্তিই জেবনের লিয়ম।'' উপমায় কথা বলে চলে মানুষটি —সারা দেশের ভারি জ্বর হয়েছিল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ করমচার মত লাল, পিয়াসে বুকের ছাতি ফাটে, মাথার গোলমাল হয়ে যায়, ভুল বকে। সেই জ্বর এবার ছাড়ছে, এই মধ্যেই সেই খবর এল: দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশটা দুভাগ করে দিয়ে ইংরেজ চলে গেছে। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আসায় দুভাগেই সংখ্যালঘু হয়ে হিন্দু - মুসলমান থাকবে। মানুষটিএটাও শুনলে—বাংলাও ভাগ হয়েছে। যেদিকে হিন্দু বেশি সেই বাংলা হিন্দুস্থানে আর যেদিকে মুসলমান বেশি সেই বাংলা পাকিস্তানে। এক আবার কি রকম? এখানকার সব মোসলমান পাকিস্থানে চলে আসবে আর ওখানকার সব হিন্দু হিন্দুস্তানে। না, আসবে না। তুনি যদি মুসলমান হিশেব করো, তাহলে তোমাকে এই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, যেতে হবে পুর্ব - পাকিস্তানে। পুব-পাকিস্তানের হিন্দুদেরও চলে আসতে হবে এখানে। হয়তো তোমার এই বাড়িতে আসবে কোনো হিন্দু গেরস্থ। শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়।

আর কেউ নাই, এইবার আমি একা। আর কেউ নেই— সব চলে গেল। কদিন ধরে জ্বর আসছে। স্বামী - মেয়ে সবাই দেশান্তরী হচ্ছে—মুসলমানের দেশে চলে যাচ্ছে। নানা কারণ দেখিয়েই যাচ্ছে। দশ বছর এই নতুন বাড়িতে। পাকিস্তান হবার পর ছেলে চাকরি নিয়ে সেখানে। কলকাতায় যাওয়া আর ঢাকায় যাওয়া তো একই। ছেলে বছরে একবার আসত। তফাৎ নেই, একটু দূর বেশি— ''এই যেদি হবে, পাকিস্তান হওয়া - না - হওয়াতে যেদি কুনো তফাত-ই না হবে তাইলে এমন রক্তগঙ্গা ক্যানে করলে সবাই?' এত মানুষ মরল, এত মায়ের কোল খালি হল। মানুষটি তোলপাড় হয়ে যায় মনে। যে ন'দ্যাওর লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান করেছে সে বলে পাকিস্তানে যাব কেন? নিজের দেশ ছেড়ে? তাহলে কার জন্যে দেশটি করতে গিয়েছিলে।

ছেলেকে প্রশ্ন করে মানুষটি: ভিন দেশে চাকরি নিলে? ভিন দেশ আবার কি? ভিন দেশ না হলে ওদেশের জন্য এত লড়াই করতে হবে কেন? এ প্রশ্নের সামনে সব রাজনীতি, সব তত্ত্ব নীরব। এ মায়ের প্রশ্ন। মা বোঝে দুটি দেশ হয়েছে। বোঝে, আকালের সময় যত লোক

গিয়েছিল কলকাতায়, তার থেকে অনেক বেশি লোক আসছে। জামাইও বড় চাকরি পেয়ে পাকিস্তানে। বোর পাসপোট না কি বলে হয়েছে। আসা - যাওয়া কঠিন ! মানুষটি দেশ আলাদা হোক চায়নি, কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা বিদেশে চলে গেল। আর আলাদা দেশের জন্য যারা লাফিয়েছিল তারা তেমনই রইল। বিনা কারণে হিঁদু-মুসলমানের মাঝখানে একটা ছেঁযা পড়ে গেল। কুনোদিন তা যাবে না। এর মধ্যে মারা গেল সেই ননদ, যে বাড়ির ছেলে - মেয়েদের আগলে রাখত। আর কথা বলতে বলতে মানুষটি তার শেষ কথা বলল: 'সব মানুষের একটি করে শ্যাষ কথা থাকে, সেই কতাটির লেগেই তো সারা জীবন।' চাপ আসছে তাকেও যেতে হবে।

আমরাও তাহলে ওদের দেশে চলে যাই— মাথায় বাজ পড়ল। মরে গেলে কোথায় যাবে, মানুষটি জানে— বাড়ির কাছেই কবরস্থানে। কিন্তু দেশ ছেড়ে কোথায় যাবে? ক্যান যাবে বুঝিয়ে দিক। ওটা মুসলমানের, এটা হিঁদুর দেশ, বলে কেউ পার পাবে না। কত্তা বোঝায়, ছেলেমেয়ে নাতিপুতি যেখানে আছে সেখানে যাব না? না, যাব না— ছেলেমেয়েরা করেছে তাদের জীবনের লেগে। এ জীবন তো শেষ— শেষ হবার জন্য বিদেশে কেন যাব? মানুষটি এই প্রথম কত্তার সঙ্গে তর্ক করে। খোকার মুখ কতদিন দেখেনি, কিন্তু সেই মুখটি কেউ কেড়ে নিতে পেরেছে? গাছ বুড়িযে গেলে ভিন মাটিতে বাঁচে না। কত্তা এ মানুষকে চিনতে পারে না। এখন এই মানুষ কত্তার শেখানো কথা আর বলছে না, বলছে নিজের কথা। কত্তা আর তর্ক করে নি, জমিজমার বন্দোবস্ত করে চলে যাওয়া পাকা করে। কিন্তু মানুষটি শেষ কথা বলে, এই বাড়িতেই থাকবে। এ বাড়ির বদলি-দলিল হয়ে গেছে। না, এ বাড়িতেই থাকব, বার করে দিলে তবে যাব। শেষে কত্তা হার মানে, কিছুতে না গেলে বাড়িটা এরকমই থাকবে। দাদির দেওয়া জমিও থাকবে।

সবাইকে মানুষটি এই কথাই জিজ্ঞাসা করে : আমি ক্যানে তোমাদের সাথে দেশান্তরী হব? তাদের আলাদা দেশ আছে এটাই মানুষটি জানে না। শুধু ধর্মের জন্য একটা দেশ একটানা যেতে যেতে আলাদা হয়ে গেল? ধম্মের কথা বলো না, তাইলে পিথিমির কুনো দেশেই মানুষ বাস করতে পারবে না। জানলা দিয়ে, এখনও অসম্পূর্ণ বাড়ির জানলা দিয়ে দেখে, চলে যাচ্ছে সবাই। বাড়িতে একদম একা। কারুর কথা না শুনে মানুষটা কি ঠিক করলো? কিসের জন্য সব ছাড়লো? শেষে মনে হলো : আমি আমাকে বোঝাতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটা দ্যাশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে যিখানে শুদু মোসলমানেরা থাকবে কিন্তু হিঁদু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাহলে আলেদা কিসের। সেই দেশটা মুসলমান বলেই তার দেশ? আর ছেলেমেয়েরা আর জায়গায় গেছে বলেই তাকে যেতে হবে? আর সোয়ামি গেলে সে কি করবে? সে আর তার সোয়ামি তো আলেদা মানুষ। আপন কিন্তু আলাদা। এই শেষ প্রশ্ন ও উপলব্ধিতে একটি মানুষ ইতিহাসের বিপর্যয় পেরিয়ে এক প্রতীকী অগ্নিময় যাত্রায়, নিজের সত্তার আবিষ্কারে, ইতিহাস - দেশ সম্পর্কে প্রশ্নে এক আগুনপাখি। একা - বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একা। ঐ একাকীত্ব আসলে তার সময়ের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা পেরিয়ে এক মিলন অভিসারী। এই একা শুদ্ধ, পবিত্র, প্রতিবাদী, প্রতিরোধী।